কুর্আনের শ্রুতা: সেকাল ও একাল

আমাদের নবী মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। সত্যই তিনি প্রশংসিত। তিনি প্রশংসিত মহান আল্লাহর কাছে। প্রশংসিত ফিরিস্তাকুল, নবী-রাসূল ও মুঅ্মিনদের কাছে। মুশরিকদের কাছেও তিনি প্রশংসিত ছিলেন। সবাই তাঁর চিরিত্র ও সততার প্রশংসা করত, তাঁকে আল্-আমীন (বিশ্বাসী) বলে ডাকত।

কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করলে ক্ষেপে উঠে বেইমানরা। সবাই তাঁর দুশমন বনে যায়। তাদের এ দুশমনির মূল কারন আল্লাহর কিতাব। আসলে তাদের দুশমনি তাঁর সাথে ছিল না। তাদের আসল দুশমনি ছিল আল্লাহর বিধানের সাথে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আমি জানি তাদের কথা তোমাকে পিড়া দেয়। তারা আসলে তোমাকে অবজ্ঞা করে না। পাপিষ্ঠরা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে। (৬ আন্য়া'ম: ৩৩)

বেইমানদের আসল দুশমনি ছিল আল্লাহর বিধানের সাথে। কিন্তু সরাসরি আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করা কঠিন। এতে জনতা বিগড়ে যেতে পারে। তাই তারা অন্য পথ ধরে। সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা না করে তারা ইসলামের প্রচারকদের বিরোধিতা করে। তাদের নামে প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচারে মেতে উঠে।

তাইত যিনি ছিলেন সবার প্রিয়, সবাই এক বাক্যে যাকে আল্-আমীন বলে ডাকত। ইসলামের কথা বলতেই তিনি দুশমন বনে গেলেন। তাঁর **মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)** নামকে ব্যঙ্গ করে **মুযাম্মাম (ধিকৃত)** ডাকা শুরু হল। একই ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। আজও ইসলামের কথা বললে ভাল মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়, হাজারো মন্দ নামে বিশেষিত করা হয়।

রাসূল সাঃর কাছে কুর্আন নাযিল শুরু হল। তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কুর্আনের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করলেন। লোকজনকে শোনাতে লাগলেন পাক কালাম।

আল্লাহর কালাম শুনে অনেকে অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। কেউ আল্লাহর কালামকে জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্য করেছে। কেউ ধরেছে অন্য পথ। কুরআনের শ্রুতাদের থেকে মোট সাত ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তা হল...

১. কুর্আনের বাণী সহ্য করতে না পারা এবং আল-কুরআনের কণ্ঠকে স্তব্দ করে দিতে তেড়ে আসাঃ
মুহাম্মাদ সাঃ সবে মাত্র নবী হয়েছেন। নবী হবার পর প্রথম কয়েকদিন কেটেছে ইবাদাতে মশগুল থেকে। এবার দাওয়াতী কার্যক্রম শুরুর তাগিদ এলো। নাযিল হল আল্লাহর আদেশ...

তোমার নিকট আত্মীয়দের (পাপের পরিনতি ও আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) **সাবধান করে দাও।** (২৬শুয়া'রা: ২১৪)

আল্লাহর আদেশ পেয়ে রাসূল সাঃ স্বাফা পাহাড়ে আরোহন করলেন। উচ্ছস্বরে ঘোষনা করলেন: **ইয়া স্বাবাহা'হ !** (তখনকার দিনে বিশেষ কারনে লোকজনকে জড় করতে এমন করে ডাকা হত।)

হঠাৎ এমন ঘোষনা শুনে লোকজন কৌতুহলী হয়ে উঠল। তারা জানতে চাইল: কে এই আহ্বানকারী ? মুহাম্মাদ সাঃর কথা শুনে লোকজন জড় হল। রাসূল সাঃ আব্দুল মুত্তালিব পরিবার, আব্দু মানাফ পরিবার সহ কুরাইশ

পরিবারদের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন:
আমি যদি বলি: শত্রু পাহাড়ের পিছনে অবস্থান নিয়েছে। তারা অচিরেই আক্রমন করবে। তোমরা কি বিশ্বাস করবে ? সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব এল অবশ্যই। তুমি কোনদিন মিথ্যা বলনি।

রাসূল সাঃ বললেন: আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। (আল্লাহর বিধান মেনে নাও ! নতুবা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে)

আবু-লাহাব মক্কার প্রভাবশালী ধনবান নেতা, রাসূল সাঃর আপন চাচা। দুই হাত উত্তোলন করে সে বলে উঠল: তুমি ধ্বংস হও! এ জন্যই আমাদের ডেকে এনেছ? সে গুস্বা হয়ে চলে গেল। অন্যরাও তার অনুকরণ করল।

শুরু হল মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা। রাসূল সাঃকে ব্যঙ্গ করে **মুহাম্মাদ** (প্রশংসিত) এর স্থলে **মুযাম্মাম** (ধিকৃত) বলা শুরু হল। এসব অপকর্মে অগ্রনী ভূমিকা ছিল আবু-লাহাব ও তার স্ত্রীর। তাদের সম্পর্কে নাযিল হল:

আবু-লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে সে নিজেও। তার অর্জিত ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। সে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সাথে তার ইন্দন দাতা স্ত্রীও। তার গলায় মাসাদের দড়ি (জাহান্নামের ধিকৃত জিন্জির পড়িয়ে দেয়া হবে)। (১১১ লাহাব)

আবু-লাহাবের স্ত্রীর নাম আ'ওরা। তাকে উম্মু-জামীল নামে ডাকা হত। আ'ওরা ছিল জিদ্দী ও বদ মেজাজী। রাসূল সাঃ ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ সহ ইসলাম বিরোধী সকল অপকর্মে সে আবু-লাহাবকে সাহায্য করত।

সূরাহটি নাযিল হলে রাসূল সাঃ সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আ'ওরা জানতে পারল: মুহাম্মাদ তাকে ও তার স্বামীকে নিন্দাবাদ করে কবিতা বলছে। সে বলছে: এসব নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে ?

আ'ওরা ক্ষেপে উঠল। সে জানতে পারল: আবু-বকরকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ কা'বাহর কাছে বসে আছে। চাক্কি ঘুরানোর পুথা হাতে তেড়ে এলো আ'ওরা। সে চিৎকার করে বলছিলঃ মুযাম্মাম আমার বিরুদ্ধে কবিতা বানায় ! সে কি জানে না, আমিও কবি ? আ'ওরা কবিতা রচনা করে উচ্ছস্বরে আবৃত্তি করছিল:
মুযাম্মামান আ'স্বাইনা, আমরুহু আবাইনা, ওয়া দ্বীনুহু ক্বালাইনা। অর্থাৎ ....

ধিকৃত তুই, তোকে নেব নাকো মেনে
তোর আনিত সব করি বর্জন
মুযাম্মাম ! তব দ্বীন, আনিত বিধান
প্রত্যাখান করি তোর যত অর্জন।

আল্লাহ আ'ওরাকে সাময়িক অন্ধ করে দিলেন। সে আবু-বকরকে দেখল কিন্তু পাশে থাকা মুহাম্মাদ সাঃকে দেখল না। নাযিল হলঃ

তুমি কুর্আন পড়ছিলে। আমি আখেরাত অবিশ্বাসী ও তোমার মাঝে পর্দা ফেলে দিলাম। (১৭ইসরা: ৪৫)

মুহাম্মাদ সাঃকে না পেয়ে আ'ওরা আবু-বকরকে শাশিয়ে গেল। বলল: আবু-বকর ! তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে। তাকে পাইলে এ পুথা তার মুখে মারব। (তাফসীর কুরতুবী: খ.১০ পৃ.১৬০)

পর্যালোচনাঃ বর্তমানেও তাই হয়। কুরআনের যেসব আয়াতে তাগুতী সমাজের ভিত কেপে উঠে, বেইমান নেতাদের সার্থে আঘাত হানে যেসব আয়াত, তা বর্ননা করলে এখনো তেড়ে আসে আ'ওরার উত্তরসূরীরা। তবে তাদের হাতে পুথা থাকে না। থাকে অত্যাধুনিক মারনাস্ত্র ও ক্ষমতা। তাদের রূষানলে পড়ে কুরআনের প্রচারনকদের জেল, জুলুম সহ্য করতে হয়। সময়ে জীবন দিতে হয়।

২. কুর্আন পাঠে নিষেধাজ্ঞাঃ

আবু-কুহাফাহর ছেলে আবু-বকর। নীতিবান, আদর্শবান এক মহান পুরুষ আবু-বকর। নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, জনদরদী ও গরীবের বন্ধু আবু-বকর। গরীব দুখীরা তার কাছে আশ্রয় পায়, সাহায্য পায়, বিচার পায়। তাই সৎ, নিষ্ঠাবান এ তরুন নেতার প্রশংসা সবার মুখে মুখে।

কিন্তু ইসলাম গ্রহনের অপরাধে অত্যাচারিত হতে হল আবু-বকরকেও। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হলেন আবু-বরক। এক বিকেলে তিনি আফ্রিকার উদ্দেশ্যে মক্কাহ ত্যাগ করলেন।

পথে কারাহ গুত্রের নেতা ইবন দিগানাহর সাথে দেখা। ইবন দিগানাহ ভাবল: আবু-বকরের মত জনদরদী নেতার দেশত্যাগ জাতির জন্য কল্যানকর নয়। তাই সে আবু-বকরকে ফিরে আসার অনরোধ করল এবং স্বাধীন ভাবে আল্লাহর ইবাদাতের সুযোগ করে দেবার নিশ্চয়তা দিল। আবু-বকর রাঃ তার কথায় ফিরে এলেন। ইবন দিগানাহ সবাইকে জানিয়ে দিল: এখন থেকে আবু-বকর আমার আশ্রয়ে। কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

ইবন দিগানাহ আরবের প্রভাবশালী নেতা। তার কথা অমান্য করার হিম্মত কারো নেই। তবে বেইমানরা ইবন দিগানাহকে বলল: আবু-বকর ব্যক্তিগত ভাবে যা খুশি মেনে চলুক। তাকে বলে দাও! সমাজে যেন বিচ্ছিন্নতাবাদ না ছড়ায়। ইবন দিগানাহ বলল: আবু-বকর ! ঘরে যা খুশি কর। বাহিরে কোন ঝামেলা করতে যেও না।

কিছু দিন এভাবে কেটে গেল। আল্লাহর দ্বীন পালনে এমন বাধ্য-বাধকতা আবু-বকর মেনে নিতে পারলেন না। তিনি উচ্ছস্বরে কুর্আন পাঠ শুরু করলেন। এতে ফুসে উঠল বেইমানরা। তারা ভাবল: এভাবে চলতে থাকলে আমাদের যুব সমাজ বিপথগামী হয়ে যাবে। জাতীয় ঐতিহ্য ভুলুণ্ঠিত হবে। দেশ ও জাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তারা ইবন দিগানাহর কাছে এলো। ইবন দিগানাহ আবু-বকর রাঃকে অনুরোধ করল: উচ্ছস্বরে তিলাওয়াত না করতে বলল। অন্যথায় তাকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হবে না বলে সাবধান করে দিল। আবু-বকর ভাবলেন: যার ইবাদাত করি তাঁর আশ্রয়ই যথেষ্ট। তিনি ইবন দিগানাহকে কথাটি জানিয়ে দিলেন।

পর্যালোচনাঃ আবু-বকর রাঃর এ ঘটনা বর্তমান যামানার প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে দেশে দেশে মুসলমানদের একই অবস্থা। তবে যে দেশের মানুষ আরবী বুঝে না, সে দেশের নেতারা কুর্আন তিলাওয়াতে বাঁধা দেয় না। বরং তারাও মাঝে মাঝে শরীক হয়ে ধার্মিক সাজার তৃপ্তি অনুভব করে। এতে জন সমর্থন আদায়ের কাজটাও সহজ হয়ে যায়।

তবে সাধারন মানুষকে কুর্আনের বাণী বুঝাতে গেলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে নেতারা। শুরু করে প্রপাগান্ডা, মিথ্যাচার ও নিয়ন্ত্রন। আগের দিনে কম পক্ষে মাদরাসাহর দরসে ও মসজিদের মিম্বরে আলিমগণ কুরআনের কথা বলতে পারতেন। আস্তে আস্তে তাও নিয়ন্ত্রনের আওতায় চলে আসছে।

৩. কুর্আনের মজলিসে হট্টগোলঃ

রাসূল সাঃ কুর্আনের বাণী প্রচার করতেন। লোকজনকে কুর্আন বুঝাতেন। কুরআনের বিধান মেনে নেবার আহ্বান জানাতেন। মানুষকে কুর্আন শুনাতেন। কুর্আনের মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন।

কুর্আনের জ্ঞানগর্ভ বর্ননায় মানুষের অন্তর নড়ে উঠত। তাদের অন্তর চক্ষু খুলে যেত। তারা ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝে ফেলত। ফলে ষড়যন্ত্রের সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে লোকজন চলে আসত জান্নাতের পথে। গ্রহন করত আল্লাহর দ্বীন।

দাওয়াতের এমন পদ্ধতিতে বেইমান নেতারা পেরেশান হয়ে গেল। তারা ভাবল: যে করেই হক একে ঠেকাতে হবে। নতুবা সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমাদের মান-সম্মান ধুলায় মিশে যাবে। আমাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব চলে যাবে।

বেইমানরা কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। তারা কুরআন শুনতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। চামচাদের বলে দিল: **যেখানে মুহাম্মাদ সেখানেই প্রতিরোধ**। মুহাম্মাদ কুর্আন পড়া শুরু করলেই তোমরা হট্টগোল শুরু করবে। নাযিল হলঃ

কাফিরেরা বলে: কেউ কুর্আন শুনতে যাবে না। (কুর্আনের আলোচনা হলেই) **তাতে হট্টগোল করবে। এভাবেই সমাজে তোমাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে।** (৪১ ফুসসিলাত: ২৬)

পর্যালোচনাঃ বর্তমানে অনেক অঞ্চলে কুরআনের মাহফিলে এভাবে হট্টগোল করা হয়। এমনকি মসজিদের মিম্বরে বসেও সঠিক ভাবে কুর্আনের কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

তাই ভেবে দেখুন! আপনি কি চান ? আল্লাহ সন্তুষ্টি, না বেইমান নেতাদের খুশি করা ? ইসলাম, না ক্ষমতা? জান্নাত, না জাহান্নাম ? আপনি যা চান সে পথে অগ্রসর হন। উভয় পথ আপনার চুখের সামনে।

৪. লুকিয়ে লুকিয়ে কুর্আন শুনাঃ

রাতের নামাযে শব্দ করে কুর্আন পড়া রাসূল সাঃর অভ্যাসে পরিনত হয়েছিল। মক্কাহর নেতারা রাতের অন্ধাকরে লুকিয়ে লুকিয়ে কুর্আন শুনত বলে বাইহাকী সহ অনেক হাদীছের কিতাবে বর্নিত হয়েছে।

যারা কুর্আন শুনেছে তবে মেনে নেয়নি উল্লেখিত চার ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল তাদের। আর যারা কুর্আন শুনে মেনে নিয়েছে তাদের থেকে আরো তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যথা..

৫. কুর্আনের কিছু মানা আর কিছু না মানাঃ

এক দল মানুষ সমষ্টিগত ভাবে কুর্আন মেনে নিলেও কুর্আনের বিধান সম্পূর্ন ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা কুর্আনের কিছু মানে আর কিছু মানে না। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ

যদি বলা হয়: এসো ! (জীবন বিধান হিসাবে) **আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে মেনে চলি। তারা বলে: আমাদের পুর্বসূরী** (নেতা)**রা যা মেনে এসেছেন আমাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট। আচ্ছা তাদের পুর্বসূরীরা যদি** (ইসলাম সম্পর্কে) **অজ্ঞ ও** (আল্লাহর পথ থেকে) **বিভ্রান্ত হয়** (তখন কি হবে) **.... ?** (মাইদাহ: ১০৪)

যদি বলা হয়: এসো ! (জীবন বিধান হিসাবে) **আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলি। দেখবে, মুনাফিকরা**

কেটে পড়ছে। (নিসা: ৬১)

মুনাফিকদের ভয়: যদি কোন সূরাহ নাযিল হয়ে তাদের অন্তরের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলে দাও ! তামাশা করতে থাক, তোমরা যে ভয় করছ, আল্লাহ তা বের করে দেবেনই। (তাওবাহ: ৬৪)

দেখনি? তাদের বলা হয়েছিল: হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর। কিন্তু যুদ্ধ ফরজ করা হলে তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভাবে ভয় করতে লাগল যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহকে বা এর চেয়ে অধিক ভয়। তারা বলল: হে রাব্ব! কেন যুদ্ধ ফরজ করলে ? কেন আরো অবকাশ দিলে না ? বলে দাও ! দুনিয়ার ভোগ অতি নগন্য। মুত্তাকিদের তরে আখিরাত অতি উৎকৃষ্ট। (সবাইকে প্রতিদান দেয়া হবে) **কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।** (নিসা: ৭৭)

...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না ? তোমাদের যারা এমন করে তাদের তরে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা অপমান আর আখেরাতে অনন্ত জাহান্নাম। (বাকারাহ: ৮৫)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির। (৫ মাইদাহ: ৪৪)

পর্যালোচনাঃ এমন মানুষ তখনো ছিল এখনে আছে। বরং বর্তমানে এদের সংখ্যাই বেশী। দেশে দেশে এদেরই নেতৃত্ব ও আধিপত্য। সমাজ ও দেশের শীর্ষে আছে এরাই। তাইত বলা হয়: এ সমাজ মুনাফিকের সমাজ। নিজের ঈমান ও আমল বাঁচাতে হলে মুনাফিকের সমাজ থেকে নীতিগত দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৬. কুরআন শুনে ঈমান আনাঃ
আফ্রিকার বাদশাহ নাজ্জাশী। খৃষ্ঠান নাজ্জাশী মানবাধিকার ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ছিলেন। মুশরিকদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মক্কাহর মুসলিমগণ আফ্রিকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। মানবিক কারনে নাজ্জাশী তাদের আশ্রয় দেন এবং তাদের থেকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত হন।

নাজ্জাশীর সাথে মক্কাহর মুশরিকদের ভাল সম্পর্ক ছিল। মক্কাহর নেতারা নাজ্জাশীর কাছে প্রতিনিধি পাঠাল। তারা নাজ্জাশীকে বলল: কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভ্রান্ত যোবক পালিয়ে এসে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা বড় ভায়াবহ। এদের ধর্ম আপনার দেশ, জনগণ, মানবতা ও বিশ্ব শান্তির জন্য মারাত্মক হুমকি। এদের আমাদের হাওয়ালা করুন। অপরাধীদের আমাদের হাতে সোপর্দ করুক। যাতে এদের বিচার করা যায়। এরা উপযুক্ত সাজা পায়।

সব শুনে নাজ্জাশী মুসলমানদের ফিরত দিলে রাজি হলেন না। তিনি জানিয়ে দিলেন: আমি এদের ফিরত দিতে পারব না। নাজ্জাশী তার দেশের জ্ঞানী-গুনীদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল মক্কাহ পাঠালেন। উদ্দেশ্য: নতুন আদর্শের প্রতি আহ্বানকারী নবী ও আদর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

প্রতিনিধি দল মক্কাহ এসে রাসূল সাঃর সাথে দেখা করল। আল্লাহর নবী তাদের সূরাহ ইয়াসীন তিলাওয়াত করে শুনালেন। আল্লাহর কালাম শুনে তাদের মন গলে গেল। তাদের চুখ দিয়ে বয়ে গেল বিনয়ের অশ্রু। তাদের সম্পর্কে নাযিল হল:

দেখেছ, রাসূলের প্রতি অবতীর্ন কিতাব শুনে তাদের চুখ অশ্রুতে ভিজে গেছে। তারা সত্য জানতে পেরেছে।

তারা বলেছে: হে রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি। সাক্ষ্য দাতাদের তালিকায় আমাদের নামও লিখে নাও।
(৫ মাইদাহ: ৮৩)

পর্যালোচনাঃ এখনো এমন মানুষ দুনিয়াতে বিদ্যমান আছেন, আল্লাহর কালাম শুনে যাদের মন গলে যায়, চুখ দিয়ে বয়ে যায় বিণীত অশ্রু। তারা আল্লাহর কালামের কাছে নিজেকে সপে দেয়। জীবন বিধান হিসাবে আল-কুরআনকে মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্য করে। হে আল্লাহ ! আমাদেরকেও এদের দলভুক্ত করুন। আমীন !!

৭. কুর্আনের হক আদায় ঃ
যারা কুর্আনের সকল বিধান বিনা বাক্যে মেনে নেয়। কুর্আনের বিধানের কাছে নিজেকে সপে দেয়, তারাই প্রকৃত মুঅ্মিন। তারা পূর্ন হক আদায় করে কুর্আন পড়ে থাকেন, শুনে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতেই। মন-গড়া নীতি মেনে নয়। (যারা মনগড়া পথে চলে) **এদের বর্জন কর; যেন আল্লাহর কোন বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে।** (৫ মা-ইদাহ ৪৯)

তারা বলে: আমরা আল্লাহ রাসূল বিশ্বাস করি, তাদের আনুগত্য করি। এরপর ফিরে যায়। এরা মুঅ্মিন নয়। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) **প্রতি আহ্বান করা হলে এরা বিমুখ হয়ে যায়। আর ব্যক্তিগত ফায়দার জন্য লালায়িত হয়ে এগিয়ে আসে। তবে কি এদের অন্তরে বিমার ? না এরা সন্দিহান ? না কি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে ? আসলে এরাই অবিচারী। জীবন বিধানের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের** (ইসলামী শারীয়া'র) **প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅ্মিনের কথা হবে একটাই: শুনলাম আর মেনে নিলাম।** (যারা এমন করে) **তারাই সফল।** (২৪ নূর: ৪৭-৫১)

আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা হক আদায় করেই এর তিলাওয়াত করছে। এর সকল বিধান মেনে নিচ্ছে। যারা এ কিতাব অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। (বাকারাহ: ১২১)

পর্যালোচনাঃ মক্কাহর নেতারা নিজেদেরকে বাইতুল্লাহর সেবক, ইবরাহীম আঃর অনুসারী তথা ধার্মিক মনে করত। আর মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের মনে করত; বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজ বিরোধী, আত্মীয়তা ছিন্নকারী, ধর্মের নামে অথর্ব সৃষ্টিকারী ইত্যাদি। কুর্আন শুনার পর মক্কাহর কাফিরদের থেকে চার ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

ইতিহাস বারবার ঘুরে আসে। বর্তমানেও যারা নিজেকে মুসলমান আর প্রকৃত মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ মনে করে কুর্আনের ব্যাপারে তাদের থেকেও চার ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

১.
আজকালের নেতারাও কুর্আন শুনে, কুর্আনের মাহফিলে যায়। তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করে। তবে তাফসীর কারক ও তাফসীরের বিষয় হতে হবে তাদের চাহিদা মত।

ছোট বেলার একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমি তখন ছাত্র। বাজারের বড় মসজিদে তারাবী পড়াচ্ছিলেন একজন হাফিজ সাহেব। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলীমও ছিলেন। তিনি প্রত্যহ জোহরের পর তাফসীর পেশ করতেন।

তখন কম্যুনিজমের জয়জয়কার। আমাদের এলাকায় কয়েকজন নাম করা কমরেড ছিন। যাদের জ্বালো জ্বালো শ্লোগানে আমরা আৎকে উঠতাম। আমি তখন বুঝে উঠতে পারতাম না, ইসলামের নাম শুনলে যাদের গা জ্বালা

শুরু হয়, তারা তাফসীর শোনার জন্য এত পাগল কেন ?

তখন না বুঝলেও এখন বুঝি। আমার মনে আছে: মাওলানা সাহেব সূরাহ ইউসুফের তাফসীর করছিলেন। উনি একজন সুবক্তা ছিলেন। উনার বচন ভঙ্গিতে মনে হত: ইহা এক রোমান্টিক, লোম হর্ষক, হৃদয় বিদারক প্রেম কাহিনী। যুলাইখার রোমান্টিক প্রেম, ইউসুফের সততা ও সরলতা, ভাইদের নিষ্ঠুরতা, বাবার অসহায়ত্ব ও ইউসুফ আঃর নির্যাতিত হবার কাহিনী পুরা মাস তিনি বর্ননা করে ছিলেন।

এখন বুঝতে পারছি মক্কাহতে যেসব সূরাহ নাযিল হয়েছে এর অধিকাংশই কাহিনী। আমার মনে হয়: প্রথম দিকে নাযিল হওয়া মজাদার কাহিনী শুনতেই মুশরিক নেতাদের এমন আগ্রহ ছিল। কুর্আনের কাহিনী শুনতে তখনো তাদের আপত্তি ছিল না, এখনো নেই। বরং এতে তারা আনন্দ পায়, মজা পায়।

তাই যেসব হুজুর তাফসীর মাহফিলে বাছাই করে করে শুধু কাহিনী বর্ননা করেন তাদের দিয়ে তাফসীর মাহফিল করাতে কোন বাধা নেই ইসলমা বিদ্বেষী নেতাদের।

আর এসব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং নিজের মার্কেটের কথা বিবেচনা করে তাফসীর মাহফিলের জন্য এমন ঘটনাকেই আলোচ্য সূচী বানিয়ে থাকেন স্বনাম ধন্য অনেক বক্তা। এতে ডাবল ফায়দা। বক্তাও খুশি শ্রুতাও খুশি।

আর এমন তাফসীর শুনে সাধারন মানুষের ধারনা জন্মেছে: কুর্আনে শুধু কিচ্ছা কাহিনী বর্নিত হয়েছে। তাইত এক ব্যক্তিকে দারসে কুর্আনের দাওয়াত দিলে উনি বলেছিলেন: এ সব কাহিনী আমার জানা আছে।

২.
মুশরিকদের জাতীয় ঐতিহ্য ছিল মুর্তি সংস্কৃতি ও মুর্তি প্রীতি। তাদের প্রয়াত জাতীয় নেতারা ছিল মুর্তি ভক্ত ও মুর্তির পূজারী।

মুর্তি সংস্কৃতিকে ভ্রান্ত ও মুর্তি পূজারীদের জাহান্নামী আখ্যায়িত করে আয়াত নাযিল শুরু হলে কাফির জাতির ভিত ক্ষেপে উঠে। তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সরাসরি আঘাত লাগে। তাই ক্ষেপে উঠে মুশরিক সমাজ, সমাজের নেতারা। শুরু হয় হট্টগোল। যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় আজকাল দেশে দেশে।

কুর্আনের যেসব আয়াতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং একমাত্র আল্লাহকেই সবকিছুর উৎস বলা হয়েছে। আর মানব রচিত ও মনগড়া সকল মতবাদকে ভ্রান্তি ও এর অনুসারীদের জাহান্নামী বলা হয়েছে, এসব আয়াতের তাফসীর শুনলে ইসলাম বিদ্বেষীরা তখনো হট্টগোল করেছিল আজ ও করে।

৩.
আর কুর্আনের যেসব আয়াতে হুদুদ তথা দন্ডবিধির কথা বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজ গঠন, দেশ পরিচালনা তথা বিচার ও শাসনের কথা একং এ সম্পর্কীয় বিধিবিধান বর্নিত হয়েছে, এসব আয়াতের তাফসীর করলে বর্তমানের ইসলাম বিদ্বেষীরাও এমন আচরন করে যা করা হয়েছিল আবু-বকর রাঃর সাথে।

বেইমানরা প্রকাশ্যে কুর্আনের বিরোধিতা করতে পারে না। তবে এসব আয়াতকে মাদরাসার শ্রেণী কক্ষে সীমাবদ্ধ রাখতে হুজুরদেরকে সাবধান করে দেয়। কোন হুজুর সাহস করে প্রকাশ্যে বলতে গেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জেল জুলুম ও অত্যাচার করা হয় অথবা হত্যা করা হয়।

৪.

কুর্আনের বেশ কিছু আয়াত আছে জিহাদ, কিতাল ও ইসলামী সমাজ কায়েমের আদেশ ও নীতিমালা সম্পর্কীয়। এসব আয়তের তাফসীর করলে বেইমানরা পিস্তল হাতে তেড়ে আসে। যেমন পুথা হাতে তেড়ে এসেছিল আবু-লাহাবের স্ত্রী।

তখন ও এখনঃ

তবে দুঃখের ব্যাপার হল: কুর্আনের বাণী শুনে এখনকার বেইমানরা মক্কাহর মুশরিকদের মত প্রতিক্রিয়া জানালেও বর্তমানের মুসলিমরা তখনকার মুসলিমদের মত অনঢ় অবস্থানে নেই।

সেদিন আ'ওরার পুথা মুহাম্মাদ সাঃ কণ্ঠ স্তব্দ করতে পারেনি। কিন্তু আজকাল বেইমানদের পিস্তল আমাদের কণ্ঠকে স্তব্দ করে দিচ্ছে।

সেদিন ইবন দিগানাহর ঘোষনা আবু-বকরের কণ্ঠকে থামাতে না পারলেও আজকাল বেইমানদের ঘোষনা আমাদের থাকিয়ে দিচ্ছে।

সেদিন মুশরিকদের হট্টগোল মুহাম্মাদ সাঃর দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু আজ বেইমানদের হট্টগোল আমাদের দাওয়াতকে বন্ধ করে দিচ্ছে।

শুধু তখনকার মুশরিক নেতাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কুর্আন শুনা আর এখনকার বেইমান নেতাদের কুর্আনের কাহিনী শোনা এখনো বাকি আছে।

আর যারা মুনাফিক। যারা কুর্আনের কিছু মানে আর কিছু মানে না। বিচার, শাসন, যুদ্ধ, দন্ডবিধি ইত্যাদি সম্পর্কৃত আয়াত মেনে নিতে তখনো তাদের আপত্তি ছিল এখনো আছে। এসব আয়াত তারা তখনো মেনে নেয়নি, এখনো নিচ্ছে না। তাই তাদের প্রতিক্রিয়া সেকাল ও একালে একই। তবে তখন মুসলিম সমাজে এরা গুরুত্বহীন ছিল। সমাজের নেতৃত্ব মুঅমিনদের হাতে থাকায় এরা ভয়ে ভয়ে থাকত। আর বর্তমান সমাজে এরাই কর্তা। সমাজের চাবি-কাটি এদেরই হাতে। তাই মুঅমিনগণ সদা ভয়ে ভয়ে থাকেন।

মুঅ্মিনরা তখন যেভাবে কুরআন শুনে কেঁদেছিল, কুরআনের কাছে নিজেকে সপে দিয়েছিল, জীবন বিধান হিসাবে কুরআনকে মেনে নিয়েছিল, এখনো তাই করছে। তখনো কুর্আনের জন্য হাসি মুখে মৃত্যুকে বরন করে নিয়েছিল, এখনো নিচ্ছে। তবে এমন মুঅ্মিনের সংখ্যা তখন অনেক বেশি ছিল আর এখন খুব কম।

হে আল্লাহ ! আপন করুনায় আমাদেরকে মুঅমিনদের কাতারে শামিল কর। আমীন

লেখকঃ মুফতী সাঈদ। মুফতীও মুহাদ্দীছ।

www.muftisaeed.org.uk

তক্ষ